দারিদ্র বিমোচনে পিআরএসপি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে?

আমিনূল মোহায়মেন

পিআরএসপি (Poverty Reduction Strategy Paper বা দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র) হচ্ছে সরকারের মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের নীতি ও কৌশল সম্পর্কিত প্রধান দলিল। আগামী কয়েক বছরে সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিবে, কি কৌশল অবলম্বন করবে, কোন খাতকে কেমন গুরুত্ব দিবে - ইত্যাদি বিষয় পিআরএসপিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এটি নিতান্তই সরকারের নিজস্ব একটি দলিল এবং কোন ধরনের বাইরের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব ছাড়াই সরকার এটি তৈরী করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের হ্রাসকৃত সুদে ঋণদানের শর্ত হিসাবে এই কৌশলপত্র তৈরী করা হয়েছে এবং এটি তৈরীর প্রতিটি ধাপে ঋণদাতা গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত ষাটটির মত স্বল্পোন্নত দেশ তাদের পিআরএসপি তৈরী করেছে।

পিআরএসপি প্রণয়ণের শুরু থেকেই সমালোচকেরা বলছেন যে, এটি আসলে দেশের উন্নয়নের জন্য তৈরী হয়নি, বরং তৈরী করা হয়েছে ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, সরকার নিজ উদ্যোগে পিআরএসপি তৈরী করেনি, করেছে ঋণদাতাদের চাপে। ফলে ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণই তার প্রধান লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশ রাতারাতি বিদেশী ঋণের বোঝা মুক্ত হতে পারবে না, ফলে তাকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কিছু শর্ত মেনে নিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শর্তগুলি যে ঋণগ্রহীতা দেশের বিপক্ষে গিয়ে থাকে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অপরদিকে ঋণদাতাদের এধরনের শর্তারোপের যুক্তি হচ্ছে যে, তারা যে দারিদ্র বিমোচনে ঋণ দিচ্ছে, সেই দারিদ্রই যদি না কমে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নই যদি না হয়, তাহলে তাদের ঋণ ফেরত পাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। কোন বানিজ্যিক ব্যাংক যেমন কোন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়ার আগে নিশ্চিত করতে চায় যে, ঋণ ফেরত পাওয়া যাবে, তেমনি এসকল ঋণদাতা সংস্থারও এ ধরনের নিশ্চয়তার বিধান করতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরীকে ঋণদানের শর্ত হিসাবে জুড়ে দেয়াকে খারাপ কিছু বলা যায় না। তাছাড়া পিআরএসপি কোন গোপন দলিল বা চুক্তি নয়। পিআরএসপি তৈরী ও চূড়ান্তকরনের প্রতিটি ধাপে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং এটিকে কেন্দ্র করে যাতে পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও পিআরএসপি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই ঢালাওভাবে পিআরএসপিকে সমালোচনা বা প্রত্যাখান না করে এর প্রতিটি দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন, যেন এর ভালো দিকগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে ও খারাপ দিকগুলি সংশোধনে সরকারকে সাধারন জনগন, মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলো চাপ দিতে পারে। এ নিবন্ধে আমরা চেষ্টা করবো দলিলটি দারিদ্র বিমোচনে কি কি কৌশল অবলম্বন করার প্রস্তাব করছে তা উপস্থাপন করে কৌশলগুলো দারিদ্র বিমোচনে সত্যিই কতটুকু অবদান রাখতে পারবে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে বিকল্প প্রস্তাবও রাখার চেষ্টা করা হবে।

পিআরএসপিতে দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে আটটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম কৌশল হিসাবে বলা হয়েছে এমন একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্ঠি করার কথা যা দরিদ্র-সপক্ষ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে। এজন্য সবথেকে জোর দেয়া হয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর । পিআরএসপি মনে করে কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা প্রয়োজন। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্ন মুদ্রা স্ফীতি, কম বাজেট ঘাটতি ও বৈদেশিক মূদ্রার ভালো রিজার্ভ। এখানে আসল ব্যাপার হচ্ছে আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য। সরকার কর ও অন্যান্য খাত থেকে যে আয় করে তার থেকে যখন খরচ বেড়ে যায় তখন বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। ঘাটতি মেটাতে সরকারকে বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে দেশ চালাতে হয়। পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়া গেলে অধিক টাকা ছাপিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, তখন মূদ্রা স্ফীতি দেখা দেয়। তাছাড়া আমরা রফতানির চেয়ে অনেক বেশী আমদানী করে থাকি। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রার প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক মূদ্রার সংকটের কারনে তার দাম বেড়ে যায়। তখন বেড়ে যায় আমদানিকৃত পণ্যের দাম। ফলে বাজার দর অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে তা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া ত্বরিৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। পিআরএসপি বলছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব দারিদ্রকে বাড়িয়ে দেয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর তার প্রভাব বেশী মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। মূদ্রাস্ফীতির কারনে নিম্ন ও বাধা আয়ের লোকরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পিআরএসপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মূদ্রা ব্যবস্থাপনা ও পুজি বাজার ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করার কথা বলেছে।

বাংলাদেশ গত এক দশকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে বলে অনেকে মনে করেন। অর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনতে সমর্থ হবার কারনে অত্যন্ত খারাপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণের ও স্মরণকালের সবথেকে বড় বন্যা মোকাবেলার পরও সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার গোড়ার কথা হচ্ছে কত আয় আর কত ব্যয় তার শ্রেণীবদ্ধ সঠিক হিসাব নিয়মিত যেন নীতি নির্ধারকদের হাতে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা। যদি খরচের সঠিক হিসাব সময়মত না পাওয়া যায়, তাহলে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ যেমন করা যায় না তেমনি জনগনের অর্থের অপচয়ও বন্ধ করা যায় না। তাছাড়া ব্যয়ের সঠিক হিসাব ছাড়া কার্যকর পরিকল্পনাও করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ সফল হয়েছে। সরকারের হিসাব পদ্ধতিতে সংস্কার ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের কারনে এখন হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের ডাটাবেজ থেকে খুব সহজেই জানা সম্ভব যে, কোন উপজেলার কোন অফিসে কোন খাতে কত খরচ হযেছে। একই ভাবে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন খাতে বাজেট কত ছিল এবং তার বিপরীতে কত খরচ করেছে, তাও অতি সহজে কম্পিউটার সিস্টিম থেকে বের করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিটি বিল-ভাউচার যেন কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে সে উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাদের দপ্তরসমূহ ও জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস সমূহকে কম্পিউটারীকরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ উদ্যোগ সফল হলে সরকারী অর্থের অপচয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারে ব্যয় ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হবে।

তবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি হচ্ছে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রবর্তন। সরকার ইতোমধ্যে চারটি মন্ত্রণালয়ে সফলভাবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আগামী অর্থ বছরে (২০০৬-০৭) আরও ছয়টি মন্ত্রণালয়ে কাঠামোটি প্রবর্তনের কথা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়গুলোকে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ক্ষমতায়ণ করা হচ্ছে অপরদিকে বাজেট বরাদ্দ ও খরচের সাথে মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের কর্মকান্ড সরকারের দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল এবং দারিদ্র

বিমোচনে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিশ্লেষণ করে দেখার সুযোগ হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকান্ডগুলোতে বেশী জোর দেয়া যাবে, তেমনি সরকার আরও বেশী পরিকল্পিত উপায়ে প্রকল্প নিতে পারবে। বর্তমানে দেখা যায় একই উদ্দেশ্যে একাধিক প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে যাদের নিজেদের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকে না। আশা করা যায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এ অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

পিআরএসপি বলছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে সরকারী ব্যায় নিয়ন্ত্রণের জন্যও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে জনগনের অর্থের অপচয় রোধ হয় । এ উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যায় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ইতোমধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে এবং সে রিপোর্টের কিছু কিছু বস্তবায়নও শুরু হয়েছে। তাছাড়া সরকারী ব্যায় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বছরই সরকার অর্থবছরের প্রথমার্ধে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। তবে সেসব পদক্ষেপের একটি দূর্বল দিক হচ্ছে যে, তাতে বর্তমানের প্রয়োজনটি বেশী করে দেখা হয়; ফলে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা দেশী অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিদেশী উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে ঋণের টাকায় বিলাসবহুল গাড়ী কেনা ও বিদেশ ভ্রমণের মত অপচয় অব্যাহত থাকে।

পিআরএসপি মূদ্রা ব্যবস্থাপনাতেও সংস্কারের সুপারিশ করেছে যেন বাজার দরের স্থিতিশীলতা, পুজি বাজারে পরিমিত সুদে পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহ এবং প্রতিযোগীতামূলক মূদ্রা বিনিময় হার নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে ভাসমান মূদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে সফলই বলা যায়। তবে অতি মাত্রায় আমদানি প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় মূদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। পিআরএসপি বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।

দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে পিআরএসপি বানিজ্য বাড়ানোর উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, নায্য ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেন কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসা না করতে পারে। স্বীকার করা হয়েছে যে, বিদেশী কোম্পানীগুলো বিভিন্নভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে। তবে তার থেকে বেরিয়ে আসার তেমন কোন কার্যকর কৌশলের কথা পিআরএসপি বলেনি। উপরন্তু বানিজ্য উদারীকরণের প্রতি এতো বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং আমদানি বানিজ্য বৃদ্ধিকে যেভাবে উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়েছে তাতে পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে দলিলটি বাংলাদেশে ব্যবসাকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানদের কোন সমিতির কৌশলপত্র। বাংলাদেশ গত একযুগেরও বেশী সময় ধরে উদার বানিজ্যনীতি গ্রহন করেছে। এ নীতি এতো উদার যে তাতে দেশের স্বার্থের বিষয়টি খুব কমই দেখা হয়েছে। পাশ্ববর্তী দেশের জন্য আমরা আমাদের বাজারকে একেবারেই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। অপরদিকে উক্ত দেশটি বাংলাদেশের মাত্র কয়েকটি পণ্যকেও তাদের বাজারে বাধাহীন প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ।

যারা বানিজ্য উদারীকরনের কথা বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, আমাদের পণ্যকে বিশ্ব বাজারের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় না ফেললে তাদের গুনগত মান বাড়বে না আর গুনগতমান না বাড়লে বিশ্বায়নের যুগে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। অপরদিকে বিশ্বায়নের বিরোধীদের যুক্তি হচ্ছে যে, বানিজ্য উদারীকরণের নামে একদিকে আন্তর্জাতিক পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়া হয়, অপরদিকে দেশীয় পণ্যের মান বাড়াবার কোন উদ্যোগ নেয়া হয় না। ফলে দেশীয় পণ্য এক অসম প্রতিযোগীতার মধ্যে পড়ে।

শিশু লালন-পালনের সাথে বিষয়টির মিল রয়েছে। আপনার শিশুকে যদি সর্বদা প্রতিকূল পরিবেশে থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাকে যদি কখনও রোদে পুড়তে, বৃষ্টিতে ভিজতে ও গরমে ঘামতে না দেন তাহলে রোদ, বৃষ্টি ও গরমের দেশে তার জন্য ভালোভাবে বেঁচে থেকে জীবন চালানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। তবে এ কথাও সত্য যে, তাকে যদি আঁতুর ঘর থেকেই প্রতিকূল পরিবেশে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার বেঁচে থাকাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে সঠিক পথ হচ্ছে তাকে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে বিশেষ যত্নে লালন-পালন করতে হবে, তারপর সে যখন একটু একটু করে বড় হবে তখন তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে প্রতিকূল প্রকৃতির মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রেও সেরকমটিই করতে হবে। কিন্তু আমরা তাকে অতি শৈশবেই রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, অথচ তার জন্য অতি প্রয়োজনীয় যে পুষ্টি তা সরবরাহ করিনি। ফলে আমাদের অনেক শিল্পই আজ বিলুপ্তপ্রায়। আমাদের এক সময়কার শিল্পনগরীগুলো এখন সন্ত্রাসের নগরীতে পরিনত হয়েছে। এজন্য দূর্বল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যতটুকু দায়ী, শিল্প-কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে সৃষ্ট বেকারত্ব তার থেকে কম দায়ী নয়।

একতরফা বানিজ্য উদারীকরন যে আমাদের তেমন কোন উপকারে আসেনি, তা আমাদের আমদানি-রফতানির পার্থক্য দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের রফতানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অত্যাধিক বেশী এবং তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। শুধু মাত্র প্রতিবেশী দেশটির সাথে আমাদের বানিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বছরে বিশ হাজার কোটি টাকার মত। পিআরএসপি প্রণেতারা এ বিষয়টি কিভাবে ভুলে গেলেন তা বোধগম্য নয়। এটিও বোধগম্য নয় যে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবেশী দেশের সাথে অসম প্রতিযোগীতার মধ্যে ফেলে ধ্বংস করার মাধ্যমে কিভাবে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, পিআরএসপি চায় যে, বাংলাদেশের জনগন শুধু মাটির তৈজসপত্র এবং বাঁশ ও বেতের সৌখিন দ্রব্যাতি তৈরী করবে আর তাদের শিল্প পণ্যের পুরো বাজারটি বিদেশের হাতে ছেড়ে দিয়ে তার দারিদ্র বিমোচন করবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য পিআরএসপি ক্ষুদ্র-আর্থিক খাতে সংস্কারের কথা বলেছে। ক্ষুদ্র ঋণের সফলতার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পিআরএসপিতে তার সীমাবদ্ধতার দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে গ্রামীন ব্যাংক ও পিকেএসএফকে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণের মডেল হিসাবে দেখা হলেও তারা ও অন্যান্য এনজিও সমাজের দরিদ্রতম অংশের কাছে পৌছতে পারেনি। ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল তাদেরকেই ঋণ দেয় যাদের কিছু সহায় সম্বল রয়েছে। একবারে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। তাছাড়া এ সকল ঋণের সুদের হার এতো বেশী যে অনেক ক্ষেত্রে ঋণ ও সুদ শোধ দিতে গিয়ে শেষ সহায় সম্বলটুকুও ঋণগৃহীতাদের হারাতে হয়। অনেক ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে অস্বচ্ছতার কথাও পিআরএসপি উল্লেখ করেছে এবং একটি সহজ কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহনের কথা বলেছে যার ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। একথা যেমন সত্য যে, ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্রের শিকল ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি অভাবনীয় সাফল্য এনেছে তেমনি এ বিষয়টিও বিবিচনা করার সময় এসেছে যে, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ ঋণের জালে আটকা পড়ছে এবং দরিদ্রের সংখ্যা কমলেও হতদরিদ্র ও ভাসমান মানুষের সংখা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এনজিওসমূহ একেতো সুদের হার অত্যন্ত বেশী আদায় করে; তদুপরি তাদের কিস্তির ব্যবস্থাটি এমন যে, ঋণ থেকে উপকার পাবার সম্ভাবনা কমে যায়। তারা সমিতি গঠন করে ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে একজন সদস্যকে সমিতির সঞ্চয় স্কীমে কিছু টাকা জমা দিতে হয়। কোন

সদস্য যদি এক হাজার টাকা সঞ্চয় স্কীমে জমা দিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেয়, তাহলে উক্ত উদ্দেশ্যে সে মাত্র আড়াই হাজার টাকা খরচ করতে পারে, বাকী টাকাটা তাকে রেখে দিতে হয় সাপ্তাহিক কিস্তি দেয়ার জন্য। কেননা ঋণ নেয়ার পরবর্তী সপ্তাহ থেকেই তাকে কিস্তির টাকা পরিশোধ শুরু করতে হয়। যারা প্রকল্পে পুরা টাকাটা বিনিয়োগ করে ফেলে তাদের পক্ষে কিস্তির টাকা শোধ করাটা কষ্টকর হয়ে যায়। তাছাড়া অভাবের তাড়নায় অনেকেই ঋণের টাকা সংসার চালানো, চিকিৎসা ব্যয়, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি খাতে খরচ করে ফেলে। অধিকাংশ এনজিও কেবলমাত্র মহিলাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার স্বামী, ভাই বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্য বিভিন্ন উপায়ে ঋণের টাকাটি নিয়ে অন্য খাতে খরচ করে ফেলে। এসব কারনে দেখা যায়, অধিকাংশ গ্রহীতা একইসাথে তিন বা চারটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। এভাবে তারা একটি বিপদজনক ঋণজালে জড়িয়ে পড়ে যা থেকে বের হতে কখনো কখনোও তাদের ভিটামাটি ও শেষ সম্বল বিক্রি করে দিতে হয়।

যদিও অধিকাংশ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান দাবী করে যে, তারা বিভিন্ন উৎপাদনশীল প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে এবং ঋণের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও তারা প্রদান করে, কিন্তু বাস্তবে কারিগরি সহায়তার বিষয়টি তেমন লক্ষ্য করা যায় না। ঋণের সাথে যেন পর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা দেয়া হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও অরো কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যতিক্রমী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তারা ঋণ গ্রহীতাকে ক্যাশ টাকা না দিয়ে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে দেয়। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন ঋণের টাকা অন্য ক্ষেত্রে খরচের উপায় থাকে না, তেমনি তার প্রকৃত উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারও নিশ্চিত করা যায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতীশলতা অর্জনের লক্ষ্যে পিআরএসপি দ্রুত বেসরকারকিরণের কথাও বলেছে। এ কথা সত্য যে, স্বাধীনতার পরপরই সকল শিল্প-কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ ও দলীয় লোকদের সেখানে নিয়োগদানের ফলে আমাদের লাভজনক শিল্প-কলকারাখানাগুলি রাতারাতি লোকসানের শ্বেতহস্তীতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসানের মাত্রা কিছুটা কমানো গেলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা গেছে। প্রতি বছর জনগনের করের টাকা থেকে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে এই কল-কারাখানাগুলোকে চালিয়ে রাখতে হয়। লোকসানের বিষয়টি যেমন সত্য তেমনি লোকসান কমাতে গিয়ে সেগুলিকে নির্বিচারে বেসরকারীকরণের ফলাফল যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর খুব একটা ভালো হয় না, তাও সত্য। আমাদের দেশে বেসরকারীকরণ মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে পানির মূল্যে বিক্রি করে দেয়া। বিক্রয় মূল্য এতো কম হয় যে, তা দিয়ে উক্ত স্থানের জমির দামও হয় না। তদুপরি বিক্রয় মূল্য প্রদানের কিস্তির ব্যবস্থা ও শর্তাদি এমন থাকে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব কম টাকাই সরকারের কোষাগারে জমা হয়। ফলে আমাদের দেশে বিরাষ্ট্রীকরণের মানে দাড়িয়েছে কল-কারখানাগুলো বন্ধ করে সেগুলি সরকারের নিকট-জনদেরকে প্রতীকি মূল্যে দিয়ে দেয়া।

বিরাষ্ট্রীকরণের আরও বেশী মারাত্মক প্রভাবটি পড়ে দেশের আইন শৃংখলা ও পণ্য বাজারের উপর। বেচে দেয়া মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা বেকার হয়ে পড়ে। গোল্ডেন হ্যান্ডশেক জাতীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে চাকরী হারানো শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অর্থ দেয়া হলেও তাদের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। হঠাৎ করে বেকার হওয়া এসব শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি অংশ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। বিচার-বিবেচনাহীন বিরাষ্ট্রীকরণের কারণে এককালের সমৃদ্ধ শিল্প নগরী খুলনা এখন সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছে।

সরকার যখন কোন মিল-কারখানা বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের উৎপাদিত পণ্যের স্থান দ্রুত দখল করে নেয় বিদেশী পণ্য। দেশের পণ্যের বাজার এভাবে বিদেশীদের দখলে চলে যায় যা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। পিআরএসপি যখন দ্রুত বিরাষ্ট্রীকরনের কথা বলেছে তখন এই সকল দিকগুলি বিবেচনা করেনি। একদিকে উদার বানিজ্যনীতিকে আরও উদার করতে বলছে; অপরদিকে বলছে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প-কলকারাখানাগুলি বিক্রি করে দিতে। কিন্তু তার ফলে যে বেকারত্ব বেড়ে যাবে ও দেশের পণ্য বাজার পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে চলে যাবে, তার থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে পিআরএসপি কিছু বলেনি। মিল-কলকারাখানাগুলো বন্ধ করে দেয়ার আগে যেন বেসরকারী খাতে সে ধরণের ও সে ক্ষমতার মিল-কলকারাখানা স্থাপিত হয় তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট নীতিমালা থাকা উচিৎ এবং পিআরএসপিতে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিরাষ্ট্রীকরণের পূর্বে সেগুলিকে লাভজনক করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। মিসর সহ কিছু দেশ এ ধরণের কৌশল অবলম্বন করে সফল হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত এক দশকে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে ৪৬ কোটি ডলার বা তিন হাজার কোটি টাকা (সূত্রঃ ওয়াল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০০৫)। তবে এ বিনিয়োগ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা চিন্তার বিষয়; কেননা, বিনিয়োগের সিংহভাগ হয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ খাতে; শিল্প-উৎপাদনে এসেছে খুবই অল্প পরিমানে। সেবাখাতে বিদেশী বিনিয়োগ কার্যতঃ দেশের অর্থ বিদেশে নিয়ে যাবার পথই সুগম করে। টেলিযোগাযোগ খাতে বিপুল বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষতিকর ফল ইতোমধ্যে দেশের অর্থনীতির উপর পড়া শুরু হয়েছে। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের লভ্যাংশ নিয়ে যাওয়ার কারনে ডলারের দাম বেড়েই চলেছে। পিআরএসপি বলছে সরকার পরিবর্তনের সাথে নীতির পরিবর্তনের অভ্যাস, লাল ফিতার দৈরাত্ম ও দূর্নীতি, অবকাঠামোগত সমস্যা, নিম্নমানের বন্দর ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি - প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করা গেলে আরও অধিক পরিমাণে সরাররি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিআরএসপি বেসরকারী খাতের বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে দেখেছে। এ জন্য বেসরকারী খাতকে যথাথত আর্থিক সুবিধাদান, শিল্প ও বানিজ্যিক এলাকার কাছে খাস জমিতে বেসরকারী শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া, নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তা তৈরী ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিআরএসপি আরও যে সকল সুপারিশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে দক্ষদার চাহিদা রয়েছে সে সকল বিষয়ে যেন প্রচুর পরিমানে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা যায় সে জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীদের জন্য উন্নত কর্মসংসংস্থানের সুযোগ তৈরী, ঋণ সুবিধা বাড়ানো ইত্যাদি। আমাদের জনশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মসংস্থান হয় বিদেশে। আমাদের বৈদেশিক মূদ্রার চাহিদার একটি বড় অংশ তারাই যোগান দেয়। কিন্তু বিদেশে আমরা যে জনশক্তি রপ্তানী করি, তার বেশীরভাগই অদক্ষ। ফলে তারা অনেক কম উপার্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে ভাষাও একটি অন্তরায় হয়ে কাজ করে। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানীর থেকে যে আয় হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। অথচ, আমাদের দেশে আরবী ভাষা শেখার তেমন কোন সুযোগ নেই। আরবী জানা না থাকার কারণে আমাদের শ্রমিকেরা মধ্যপ্রাচ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারছে না। দেখা গেছে যারা কোনভাবে আরবী শিখেছে, তারা তুলনামূলক অধিক বেতনের চাকরী খুজে নিতে পারে। এদের অনেকে চাকরীর পাশাপাশি ব্যবসা-বানিজ্যও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের এক সূবর্ণ সুযোগ রয়েছে। দেশে

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ এমনিতেই অতি সীমিত। সরকারী চাকরীতে তাদের নেয়া হয় না। তারা এমন কিছু শেখে না যা দিয়ে বেসরকারী খাতে ভালো কাজ পেতে পারে। তাদেরকে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠানো গেলে একদিকে যেমন দেশের শিক্ষিত বেকারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মসংস্থান করা যাবে, তেমনি দেশ প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন করতে পারবে। পিআরএসপিতে এ সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশলের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

দারিদ্র বিমোচনের দ্বিতীয় কৌশল হিসাবে কৃষি, পানি সম্পদ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষি খাতে থেকে আমাদের জিডিপির ১৪ শতাংশ এসে থাকে। এখনও পর্যন্ত এ খাতটিতেই দেশের সবথেকে বেশী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। পিআরএসপি বলছে যে, সরকার এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে যা কৃষি ও গ্রামীন অ-কৃষি খাতকে এবং ক্ষুদ্র কৃষকের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

কৃষি খাতে বাংলাদেশ প্রচুর উন্নতি করলেও একটি জমিতে যে পরিমান ফসল উৎপাদন হওয়ার কথা, আমাদের কৃষকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অনেক কম উৎপাদন করে থাকে। এর কারন হিসাবে বিশেষজ্ঞগন মাটির উর্বরতা হ্রাসকে দায়ী করছেন। ঠিকমত না জেনে সার ব্যবহারের কারনে অনেক ক্ষেত্রে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মাটি উর্বরতা হারায়। তাছাড়া আমাদের কৃষকেরা বীজ, সেচ ও সারের পিছনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগও করতে পারে না। আবার বেশী খরচ করে উৎপাদন বাড়ালেও কৃষকের তেমন লাভ হয় না। তাকে যে দামে ফসলটি বিক্রি করতে হয়, তাতে তার খুব একটা লাভ থাকে না। এর মূল কারন হচ্ছে প্রতিবেশী দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়া হয় খুব কম। ভারতে জ্বালানী তেলের দাম আমাদের থেকে অনেক বেশী হলেও তাদের কৃষকেরা অত্যন্ত কম মূল্যে সেচের জন্য ব্যবহৃত তেল, সার ও বীজ কিনে থাকে। ফলে আমদানীকৃত চাল, ডাল ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের দাম আমাদের কৃষকের উৎপাদিত পণ্য থেকে কম পড়ে। আবার আমাদের কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। কৃষক যখন এক টাকা কেজি হিসাবে মুলা বিক্রয় করে তখন রাজধানীতে তা ভোক্তারা কেনে দশ টাকা কেজি হিসাবে। সবজি ও ফল সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা কৃষকের নাগালের মধ্যে না থাকা এবং এ জাতীয় পণ্য পরিবহনের যথাযথ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারনে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

এ সকল কারনে পিআরএসপি কৃষিতে ভর্তূকি বাড়ানোর কথা বলছে। পিআরএসপির এ সুপারিশ অনুসারে ইতোমধ্যে সরকার বর্তমান বছরের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া কৃষকেরা যেন প্রয়োজনের সময়ে হ্রাসকৃত ও সঠিকমূল্যে বীজ, সার কীটনাশক পেতে পারে, প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা যেন ঋণ পায় এবং কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের যথাযথ ব্যবস্থা যেন তাদের নাগালের মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা নেবার কথাও বলা হয়েছে।

কৃষিকে বানিজ্যিকভাবে লাভবান করার জন্য পিআরএসপি শস্য বহুমুখীকরনের উপর জোর দিয়েছে যেন উচ্চ মূল্যের ফল, ফুল, সবজী, ওষধি ও সৌখিন গাছ-পালা চাষের প্রচলন বাড়ে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার পাশাপাশি সেগুলি প্রক্রিয়াজাতকরন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরীর সুপারিশ করা হয়েছে। সবজী ও ফুল ইতোমধ্যে আমাদের রফতানী তালিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে তা দেশের জন্য আরও বৈদেশিক মূদ্রা নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

কৃষিখাতে অনেক উপকারী ও সাহসী কৌশলের কথা বলার জন্য পিআরএসপি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের জনগনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পিআরএসপি দেখতে পায় নি বলে মনে হতে পারে। কৃষিতে বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। এসব কিছু ঘটেছে সমাজের এমন একটি শ্রেণীর মাধ্যমে যাদের কৃষি বিষয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এবং যারা সব থেকে কম অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে কৃষিতে যদি শিক্ষিত ও অধিক বিনিয়োগে সক্ষম শ্রেণীটিকে আকৃষ্ট করা যায় এবং কৃষকদেরকে যদি তাদের পেশার বিষয়ে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষিত করে তোলা যায়, তাহলে কৃষি উৎপাদন অনেক গুন বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা রয়েছে সে বিষয়ে পিআরএসটিতে কিছু বলা হয় নি।

মৎস খাতটিকেও পিআরএসপি দারিদ্র বিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পিআরএসপি বলছে এখাতে বাংলাদেশ প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস খাতকে কাগজে কলমে যতই সফল বলা হোক না কেন, বাজারে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যে কষ্টকর তা যে কেউ স্বীকার করবেন। একেতো মাছ সহজলভ্য নয়, অপরদিকে বাজারে পাওয়া মাছের একটি বড় অংশ এসে থাকে পাশ্ববর্তী দেশদুটি থেকে। সরকার খাতটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হয় না। এখাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ অনেক কম; তদুপরি দূর্নীতি ও অপচয়ের কারণে সে বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন কাজে আসে না। বিভিন্ন প্রকল্পের নামে নদীতে কোটি কোটি টাকার মাছ ছাড়া হয় কাগজে কলমে; বাস্তবে কতটুকু কাজ হয় তার হিসাব রাখা যায় না। এ খাতের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কৌশলের কথা পিআরএসপি বলতে পারেনি।

গত এক দশকে পোল্ট্রী খাতে বাংলাদেশ প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। এ খাত আমাদের জনগনের প্রোটিনের চাহিদার একটি বিরাট অংশ যোগান দিচ্ছে। তাছাড়া মুরগী ও ডিমের সহজলভ্যতার কারনে জনগনের পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে সে হারে পশু সম্পদ ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যেতে পারিনি। পিআরএসপি এ জন্য সরকারী বরাদ্দের স্বল্পতাকে দায়ী করেছে। তার বাইরে তেমন কোন কৌশলের কথা বলা হয় নি। অথচ, মৎস, পোল্ট্রী ও পশুসম্পদ খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে এ খাতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের অভাব। কৃষকের ছেলেও যখন প্রাইমারী স্কুলের গন্ডী পার হয় তখন সে আর মাঠে যেতে চায় না; উচ্চ শিক্ষিতদের কথাতো বাদই দিলাম। অপর দিকে মৎস চাষ, পোল্ট্রী, পশুপালন - ইত্যাদিতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তেমন অনাগ্রহ দেখা যায় না। এ খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনও অনেক কম। এমনকি এনজিও সমূহের গঠিত সমিতিগুলো কাগজে কলমে এ ধরণের প্রকল্পে ঋণ ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে থাকে। কেন এনজিওগুলোর কাগজে কলমে থাকা লক্ষ লক্ষ মৎস চাষ ও পশুপালন বিষয়ক প্রকল্প থেকে কোন উৎপাদন চোখে পড়ছে না, কেন সমাজের এক কোটিরও বেশী বেকার তরুণ-তরুণী ঘুষ দিয়ে চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে; অথচ, মৎস চাষ ও পশুপালনের কোন উদ্যোগ নিয়ে বেকারত্ব ঘুচাতে উদ্যোগী হচ্ছে না তার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে পিআরএসপিতে সুনির্দিষ্ট কৌশলের উল্লেখ থাকা দরকার।

পিআরএসপি বলছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিন-চতুরাংশ কর্ম সংস্থান আসে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে। শিল্পোন্নয়নে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করে। র্কসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে এ খাতের গুরুত্বের কথা পিআরএসপি বললেও এ জন্য সুনির্দিষ্ট কোন মৌলিক কৌশলের কথা না বলে বরং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা ঠিক করা, বিসিকের মাধ্যমে বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রদান - ইত্যাদির মত কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছে।

বস্তুতঃ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বাধা হচ্ছে দুটো। প্রথমতঃ আমাদের চাকরী মানসিকতা। আমরা স্কুলে ভর্তি হই এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, লেখাপড়া শেষ করলে আর কাজ করতে হবে না। একটা চাকরী পাবো, মাস গেলে বেতন পাবো। লেখাপড়া শেষ করার পরও কাজ করতে হবে বা ব্যবসা করতে হবে, এই ধারনা সহজে আমরা গ্রহন করতে পারি না। এটি আমাদের এ প্রজন্মের দোষ নয়। বরং ঐতিহ্যগত ভাবেই আমাদের সমাজ কাঠামো কর্মবিমুখ। এক সময় এখানে যে শ্রেণীভেদ প্রথা ছিল সেখানে ও কর্মজীবিদেরকে রাখা হয়েছিল একদম নীচে। ফলে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বউদ্যোগী হয়ে কোন কিছু করতে পারছে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাতি হিসাবে আমাদের আত্মমর্যাদার অভাব। আমাদের ধারণা যা কিছু বাংলাদেশের বাইরের তাই-ই ভালো আর যা কিছু বাংলাদেশের তাই-ই খারাপ। এমন মধ্যবিত্ত পাওয়া দুস্কর যিনি দোকানে গিয়ে বিদেশী পন্য খোঁজেন না। তিনি দাঁত মাজবেন, তার জন্য বিদেশী পেস্ট দরকার। তিনি গোসল করবেন, তার জন্য বিদেশী সাবান দরকার। আমরা দু' দু বার স্বাধীন হয়েছি বটে; কিন্তু নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানবোধ আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ফলে যদিও বা কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন শিল্প প্রতিষ্ঠায়, তাদের পণ্য দেশেই বাজার পাচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে এই দুটি মূল বাধা দূর করতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে কর্মবিমূখতার উত্তরাধিকারকে কর্মমুখীতাতে পরিনত করতে হবে। এসব প্রচারণার পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে শিল্পায়ন-বিরুদ্ধ বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করা।

দারিদ্র বিমোচনের দ্বিতীয় কৌশলের অংশ হিসাবে পিআরএসপি গ্যাস, সৌর শক্তি, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের ব্যবহার বাড়ানোর কথা বলেছ। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে পিআরএসপি বিদেশীদের স্বার্থ অন্ধভাবে সংরক্ষনের প্রস্তাব করেছে। পিআরএসপি তার গ্যাস ও কয়লা সম্পর্কিত আলোচনা এ দুটি সম্পদের ব্যবহার বাড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছে যাকে অনেকে হাস্যকর মনে করতে পারেন। যেমন, গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, গ্রামের মহিলারা যদি গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পেত, তাহলে জ্বালানী সংগ্রহের জন্য তাদের যে সময় ব্যয় হয় তা তারা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারতো। অথচ, তেল,গ্যাস ও কয়লা উত্তোলনের প্রসঙ্গটিই পিআরএসপি এড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ নিয়ে আমাদের মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও রাজনীতিকদের রহস্যজনক নীরবতার কারনে আমরা বুঝতে পারিনা যে এ সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ কত এবং তার কত অংশ বিদেশীরা নিয়ে যাচ্ছে। বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উল্লেখ ছিল যে, অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের দায়িত্ব সরকারী সংস্থা বাপেক্সকে দেয়া হবে। পিআরএসপি এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। বাপেক্সকে ধীরে ধীরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশীদের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। এই নামমাত্র মূল্যটি এতো কম যে, অনেকের কাছেই তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। সরকারের খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা অনুযায়ী উত্তোলিত কয়লার ৯৪ শতাংশ পায় বিদেশী কোম্পানী ও বাকী ৬ শতাংশ পায় বাংলাদেশ (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫)। এ তথ্যটি জানার পর মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশ এখনও কোম্পানী শাসনের অধীনে রয়েছে। পিআরএসপিতে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সরকারের নীতিমালা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং তাতে যেন দেশের স্বার্থ রক্ষা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার।

পিআরএসপি বলছে যে, সরকার মনে করে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ, গ্রামীন জনগনের জন্য ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি ও হাইটেক পার্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তবে উপস্থাপিত কৌশলগুলোকে আরও সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির নিকট থেকে আমরা মূলতঃ চার ধরনের উপকার পেতে পারি। ১. তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত পণ্য যেমন সফটওয়্যার তৈরী ও রফতানী করে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক দ্রবাদি দেশে প্রস্তুত করা যেতে পারে। ২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে টেলি-যোগযোগ অবকাঠামোর প্রভূত উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। ইতোমধ্যে দেশে মোবাইল ফোনের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। ফিক্সড ফোনকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়াতে আশা করা যায় যে, অল্প দিনের মধ্যে যে তারও বিস্তৃতি ঘটবে। টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলে তা ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে মোবাইল ফোনের বিস্তৃতি ও তার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যাওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার সময় এসেছে। টেলিটক ছাড়া অন্য সকল মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর সিংহভাগ শেয়ার বিদেশীদের। ফলে একদিকে যেমন মোবাইল ফোনের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ দেশের বাইরে চলে যাবার কারণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে ডলারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির পিছনে মোবাইল কোম্পানীগুলোর বর্ধিত মুনাফা বৈদেশিক মূদ্রায় বিদেশে প্রেরণ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে গিয়ে যেন দেশের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকীর মুখে না পড়ে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ৩. তথ্য প্রযুক্তি খাত দেশের ইমেজ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন দেশ, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ইমেজ গড়ে ওঠে দু'একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। তার আড়ালে বাকি সব কিছু চাপা পড়ে যায়। পাশ্ববর্তী দেশটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কুসংস্কারের দেশ হিসাবে তার পরিচিতি কাটিয়ে তথ্য প্রযুক্তির কারনে অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে স্থান করে নিচ্ছে। বাংলাদেশ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ৪. তবে দারিদ্র বিমোচনে তথ্য প্রযুক্তি সবথেকে বেশী অবদান রাখতে পারে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সহায়তার মাধ্যমে। আমাদের সরকারী ব্যবস্থাটি এমনভাবে তৈরী যে, সাধারন মানুষ যেন সহজে সরকার যন্ত্রের কাছে পৌঁছতে না পারে এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সম্পর্কে সহজে কিছু জানতে না পারে। এই ধরনের ব্যবস্থার কারনে ফাইল আটকে রেখে মোটা অংকের ঘুষ নেয়া সরকারী দপ্তরগুলোরতে নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের অনেক সেবা সহজেই জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব। শুধুমাত্র যদি ফাইল ট্রাকিং সিস্টেমটি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে চালু করা যায়, তাহলে দূর্নীতি অনেক কমে যাবে। তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যাবে, কারো ফাইল কোথায়, কত দিন ও কেন আটকে ছিল। তখন মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও রাজনীতিকগন সহজেই তথ্য প্রমাণ সহ দূর্নীতিবাজ দপ্তরগুলো চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাতে পারবে। তবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সর্ব্বোচ্চ মহলের দৃঢ় সংকল্প থাকা প্রয়োজন। তা না হলে তথ্য প্রযুক্তি ও ই-গর্ভনেন্সের কথা অন্তঃসারশুন্য বাগাড়ম্বড়ের বেশী কিছু বলে বিবেচিত হবে না।

দারিদ্র বিমোচনের তৃতীয় কৌশল হিসাবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। সকল সমাজেই কিছু মানুষ থাকে যারা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে টিকে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে রয়েছে দরিদ্র বিধবা, প্রতিবন্ধী, এতিম ও সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী-পেশার মানুষ। আমাদের সমাজে তাদের সংখ্যা ও অনুপাত যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী। পিআরএসপি তাদের জন্য

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বলেছে যার মাধ্যমে সরকার তাদেরকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা করবে। এ ধরনের কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তা আমাদের দেশকে ধীরে ধীরে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে সহায়তা করবে। তবে আমাদের দেশে এ ধরনের কর্মসূচির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। অভিযোগ রয়েছে যে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার প্রদত্ত সাহায্যের একটি অংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিরা লুট-পাট করে নেয়। আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সততা ও কর্মদক্ষতার ব্যাপারে অনেক সুনাম থাকলেও তিনি তা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেন নি।

সামজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও পিআরএসপি আমাদের সমাজের ভিতরকার শক্তিটি দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের ধর্ম একটি ব্যবস্থা রেখেছে। প্রতিটি সামর্থবান মুসলমানকে তার সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে দিয়ে দিতে হয় সমাজের দরিদ্রতম অংশকে। সেখানে যাকাত দাতার নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশী অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যাকাত ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। ধর্ম যাকাতকে ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার হিসাবে ঘোষণা করেছে। আমাদের সমাজে যাকাতের প্রচলন থাকলেও যথার্থভাবে না প্রদান করায় তা দারিদ্র বিমোচনে ও সামাজিক সুরক্ষায় তেমন ভূমিকা রাখছে না। দারিদ্র বিমোচন কৌশলে যাকাতকে উৎসাহিত করা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। সরকার যদি সরকারিভাবে যাকাত আদায় করতে নাও চায়, তাহলে অন্ততঃ এমন ব্যবস্থা করতে পারে যাতে যাকাত উৎসাহিত হয় ও যাকাতের অর্থ পরিকল্পিত ভাবে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য দারিদ্র-বিমোচন সংক্রান্ত খাতে ব্যবহৃত হতে পারে।

দারিদ্র বিমোচনের চতুর্থ কৌশল হিসাবে পিআরএসপি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে দারিদ্রেম প্রধান কারন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পিআরএসপি স্বীকার করেছে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

প্রাথমিক ও স্কুলপূর্ব শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০০২ সালে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির গ্রস হার ছিল ৯৭ শতাংশ (নীট ৮০ শতাংশ) যদিও তাদের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুদের অনুপাত প্রায় সমান। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভর্তির হার সে তুলনায় অনেক কম (মাত্র ৪৩ শতাংশ)। এ ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশী। তবে পিআরএসপি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার বিষয়বস্তু ও গুনগত মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার বিষয় বস্তুর সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্ব-উদ্যোগী তৈরী ও ব্যবহারিক দক্ষতা কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই। তাছাড়া স্কুল ও বোর্ড পর্যায়ের উভয় পরীক্ষাতেই প্রধানতঃ পড়া মুখস্ত করার ক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হয়; তথ্য বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও তার মাধ্যমে যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু গড়ে উঠেছে তার কোন পরিমাপের চেষ্টা করা হয় না। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক, ক্লাসরুম ও অন্যান্য সুবিধাদির স্বপ্লতার কথাও পিআরএসপি বলেছে। এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য পিআরএসপি যে সুপারিশগুলো করেছে, তার মধ্যে রয়েছে - একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, নতুন স্কুল তৈরী ও প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা, যেন প্রতি চল্লিশ জন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে একজন শিক্ষক থাকেন তা নিশ্চিত করা এবং প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করার চেষ্টা করা।

কারিগরি শিক্ষার উপর পিআরএসপি পর্যাপ্ত জোর দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, সরকার কতৃক পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ

করতে পারছে না। এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো যেন চাকুরীর বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ করে সে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

তবে রহস্যজনকভাবে পিআরএসপি শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে দরিদ্র-সপক্ষ শাখাটির বিষয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। বাংলা মাধ্যম, ইংরাজী মাধ্যম ও মাদ্রাসা - আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই তিন শাখার মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সবথেকে বেশী অংশগ্রহণ হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। প্রায় পয়ত্রিশ লাখ ছাত্র-ছাত্রী দেশের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। দেশের শিক্ষাবিদগন দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা বলে আসছেন। পিআরএসপি সে বিষয়ে কিছু বলেনি। মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান না দেয়ার ফলে এই বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এভাবে সবথেকে বেশী দরিদ্রমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে উপেক্ষা করে পিআরএসপি কিভাবে ত্বরান্বিত দারিদ্র বিমোচোন করবে তা সত্যিই প্রশ্নের বিষয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিআরএসপি ভুলে গেছে যে, নৈতিকতা হচ্ছে মানুষকে সমস্যা থেকে সম্পদে পরিনত করার অন্যতম প্রধান উপায়। একজন মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, দক্ষ হয় কিন্তু অসৎ হয় তাহলে তার শিক্ষা ও দক্ষতা দেশের কোন উপকারে না এসে বরং তা দেশ ও দেশের মানুষের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। রহস্যজনকভাবে পিআরএসপি শিক্ষার সাথে নৈতিকতার যোগসূত্র উল্লেখ করেনি এবং শিক্ষার মাধ্যমে জনগনের নৈতিকতা বাড়ানোর কোন কথা বলে নি। বিশ্বব্যাংক বলছে যে, দূর্নীতিতে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির অর্ধেক খেয়ে যায়; দূর্নীতিকে রোধ করা গেলে দুই থেকে তিন শতাংশ জিডিপি বেড়ে যেত এবং আমাদের মাথাপিছু আয় দ্বিগুন হয়ে যেত। ফলে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র দূর্নীতি রোধ করা গেলেই আমাদের দারিদ্র বিমোচনের সিংহভাগ কাজ হয়ে যেত।

তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন সংস্কারের কথা পিআরএসপি বলতে পারে নি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উপনিবেশ আমলের তৈরী যার উদ্দেশ্য ছিল কিছু কেরানী তৈরী করা আর কিছু লোক তৈরী করা যাদের গায়ের রং এদেশীদের মত হলেও তারা নিজেদেরকে এদেশী ভাববে না। সে অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে উন্নত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় অহংকার সৃষ্টির উপাদান নেই বললেই চলে। আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়তে শিখেই জানে যে, তাদের দেশটি পৃথিবীর সবথেকে দরিদ্র দেশ। তারা বিশ্বাস করতে শেখে যে, মানুষই তাদের দেশের সবথেকে বড় সমস্যা। সে শিশুটি যখন বড় হয়, তখন বিদেশ, বিদেশী আর বিদেশী পণ্যের প্রতি তার মধ্যে অলীক মোহ তৈরী হয়। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবির দেশ বিরোধী প্রচারণা, দেশের বাজারে বিদেশী পণ্যের রমরমা ব্যবসা ও বিদেশী কুটনীতিকদের কথায় কথায় দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ডেকে আনার পিছনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান কম নয়।

বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আমাদেরকে কর্মবিমুখ করে তোলে সে বিষয়টি আমাদের নীতি নির্ধারকদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে কেউ চাষাবাদ কিংবা ব্যবসা-বানিজ্য করছে অথবা কল-কারখানা দিয়েছে - এরকমটি খুব একটা শোনা যায় না। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার সাথে কর্মদক্ষতাকে সংযুক্ত করতে শেখে ও চাকুরীর আশায় না থেকে স্ব-উদ্যোগী হতে পারে তার ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই করতে হবে। কৃষকেরা যেন কৃষি বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে সে জন্য তাদের জন্য সান্ধ্যকালীন ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে অনেক উপজেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে কাজে লাগে এমন লেখাপড়া চর্চার

কোন ব্যবস্থা না থাকায় সদ্য সাক্ষরগণ লেখাপড়ার সে প্রাথমিক জ্ঞানটি ভুলে যান। এ ধরনের কোর্স চালু করলে সেই সব সদ্য সাক্ষর জনগোষ্ঠী লেখা পড়ার চর্চা ধরে রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা গেলে তা ব্যাপক সাড়া জাগাবে। প্রতি গ্রামে যদি বছরে একজন করে কৃষকও এধরনের ডিপ্লোমা নিতে পারে তাহলে আমাদের কৃষিতে প্রকৃতই বিল্পব সংঘটিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের পর থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির ব্যবস্থা করার পিআরএসপির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা গেলে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার একটি অংশের সাথে কারিগরি শিক্ষার সমন্বয় করে পরিকল্পিত উপায়ে আরবী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা গেলে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে।

পিআরএসপি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে নি। আমাদের উচ্চ শিক্ষার এলাকাটি জনগনের অর্থ অপচয়ের একটি বড় খাতে পরিনত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা বের হয় তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ তাদের লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাকুরীতে নিয়োজিত হয়। যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পুলিশ কিংবা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবনে কাজ করতে হয়, তাহলে এ প্রশ্ন ওঠা কি স্বাভাবিক নয় যে, উক্ত পেশার জন্য আদৌ কি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রয়োজন আছে? এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের পথ বের করা প্রয়োজন।

পিআরএসপি স্বাস্থ্যখাতের বিনিয়োগকে দারিদ্র বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে দেখেছে। এ ক্ষেত্রে শিশু, মাতৃ ও প্রজননস্বাস্থ্যকে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে এইচআইভি/এইডস এর উপর প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হতে পারে। পাশাপাশি এইডস প্রতিরোধের সবথেকে কার্যকর উপায়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই মারাত্মক রোগটি পৃথিবীর অনেক দেশে মহামারী আকারে দেখা দিলেও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম অধ্যূষিত এলাকার মত বাংলাদেশে তা তেমনভাবে ছড়াতে পারেনি জন সাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের কারণে। এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় মূল্যবোধই যে প্রধান হাতিয়ার সেকথা পিআরএসপি বলতে পারেনি।

এর বাইরের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে পিআরএসপি একবারেই নিশ্চুপ থেকেছে। জনসংখ্যা কার্যক্রমের বিষয়েও দলিলটি কোন কৌশল উল্লেখ করেনি। আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই স্বাস্থ্য সেবার মান সন্তোষজনক নয়। ফলে প্রতি বছর এক লক্ষের ও বেশী রোগী কেবলমাত্র পার্শ্ববর্তী দেশে চিকিৎসার জন্য যায়, তাতে এক হাজার কোটি টাকার মত খরচ হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে গত এক দশকে প্রচুর বেসরকারী বিনিয়োগ হয়েছে এবং খাতটিতে যথেষ্ট আধুনিকায়ন হয়েছে। দেশে প্রচুর বিশেষায়িত হাসপাতাল হয়েছে ও প্রচুর যন্ত্রপাতি এসেছে। আগে যে সকল চিকিৎসা ও টেস্টের জন্য বিদেশে যেতে হতো, তা এখন দেশেই করা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের চিকিৎসকদের অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জন করেছেন। তবে এর পাশাপাশি এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ডাক্তার-নার্সদের অবহেলা ও সরকারী হাসপাতাল সমূহে অব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারনসমূহ অনুসন্ধান করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের সমস্যাগুলো আমাদের সমাজের অন্যান্য সমস্যা থেকে আলাদা নয়। এর সাথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক রয়েছে। দ্রুত ধনী হওয়ার প্রবণতা, যে কোন মূল্যে ঢাকায় থাকার চেষ্টা, দেশের মানুষকে সম্মান করতে ও ভালোবাসতে না শেখা - ইত্যাদি কারণে ডাক্তারগণ সেবার চেয়ে অবহেলার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে অনেক ক্ষেত্রে বেশী জোর দিয়ে থাকেন। এর সাথে যুক্ত হয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রীধারীদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধারনার অভাব। ফলে সরকারী তো বটেই অনেক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ব্যবস্থাপনা সংকট রয়েছে।

দারিদ্র নিরসনের জন্য মৌলিক কৌশলের পাশাপাশি পিআরএসপি চারটি সহায়ক কৌশলের কথা বলেছে। তার প্রথমে রয়েছে জনগনের পিছিয়ে পড়া অংশ যেমন নারী, শিশু, উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর অংশগ্রহন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি। দ্বিতীয় সহায়ক কৌশল হিসাবে পিআরএসপি সুশাসনের কথা বলেছে। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, জন-প্রশাসনের সংস্কার, দূর্নীতি দমন, বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকারী ব্যয় ব্যস্থাপনার উপর জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে তেমন বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয় নি। তাছাড়া সুশাসনের মূল শর্ত - শিক্ষিত জনগনের নৈতিক মানের উন্নয়নের বিষয়টি পিআরএসপি এড়িয়ে গেছে।

এছাড়া সহায়ক কৌশল হিসাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এনজিওদের সম্পৃক্ততা এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারিত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে। পিআরএসপি সব কিছুতেই একটু বেশী মাত্রায় এনজিওসমূহকে টেনে এনেছে বলে মনে হতে পারে। পৌনে তিন শত পাতার এই দলিলটিতে এনজিও শব্দটিই এসেছে তিন শত চৌদ্দ বার। পিআরএসপি নিজেই বলছে যে, এনজিওসমূহের কর্মকান্ডের মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের নামে রাজনীতিতে নাক গলাবার। সুশীল সমাজের অনেকে অভিযোগ করেন যে, বিদেশীদের নিকট থেকে টাকা এনে ঋণের জাল গ্রামে গঞ্জে বিস্তার করার মাধ্যমে পুজিবাদী দেশসমূহ আমাদেরকে ঋণজালে আটকে ফেলছে। তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় তারা সেই জাল ধরে টান দেয়। দারিদ্র-বিমোচনে এনজিও সমূহ এ পর্যন্ত কত ব্যয় করেছে এবং তার ফলে কতটুকু দারিদ্র বিমোচন ঘটেছে তার হিসাব নিকাশ করার এবং তার ভিত্তিতে দারিদ্র বিমোচনে তাদের গুরুত্ব পূন নির্ধারণের সময় এসেছে ।

সর্বশেষ সহায়ক কৌশল হিসাবে টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশের যত্নের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। একথা যেমন সত্য যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে অনেক সময় পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয় এবং জীব বৈচিত্র হুমকীর মুখে পড়ে তেমনি এ বিষয়টিও অস্বীকার করা যাবে না যে, পরিবেশের দোহাই দিয়ে অনেক সময় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়ে থাকে বা সেগুলোকে এতো বেশী ব্যয়বহুল করে ফেলা হয় যে, আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা দূরুহ হয়ে পড়ে।

পৌনে তিনশ পাতার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রটি যে যথেষ্ট বিস্তারিত তা এর ঘোর বিরোধিরাও স্বীকার করেছেন। পিআরএসপির অনেক সীমাবদ্ধতা ও দূর্বলতা থাকলেও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটি দলিলে অন্তভূক্ত করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। বিস্তারিত ও সমন্বিত কৌশল প্রণয়ণের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে দেখলে পিআরএসপিকে নিয়ে আশাবাদী হওয়া যায়। তাকে আরও বাস্তব সম্মত ও দেশজ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর যোগ্য করে তুলতে বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি, রাজনীতিক কর্মী, ধর্মীয় নেতা, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন কর্মী, মিডিয়া ও সংবাদ কর্মীদের এ বিষয়ে আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। পিআরএসপি প্রণয়ণের প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হলেও রাজনীতিকদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় নি। কোন কৌশল যদি রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভিতর থেকে আসে তাহলে তা বাস্তবায়ন যত সহজ, এনজিও, সুশীল সমাজ ও ঋণদাতাদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া হলে তা বাস্তবায়ন ততোটাই কঠিন। আমাদের সংসদ সদস্যগনের একটি বিরাট অংশ পিআরএসপি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। সংসদ সচিবালয় থেকে তাদেরকে পিআরএসপি বিষয়ে বিষদভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সাধারন জনগন তো বটেই, সরকারের কর্মকর্তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ পিআরএসপি সম্পর্কে জানে। পিআরএসপি কি চায়, কেন চায় ও

কিভাবে চায় তা যেন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা সম্যকভাবে অবহিত থাকে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য পরিকল্পনা কমিশন নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

এ ধরনের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরী হওয়া উচিৎ দীর্ঘমেয়াদি কোন পরিকল্পনার আলোকে। সে পরিকল্পনা অনেকটা ভিশনের পর্যায়ে পড়ে এবং তা আসা উচিৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের কাছ থেকে। সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারার কারণে পিআরএসপি দারিদ্র নিরসনের সবথেকে বড় হাতিয়ার - সততাকে এড়িয়ে গেছে। পৌনে তিনশ পাতার বিশাল দলিলটিতে সততা শব্দটির কোন উল্লেখ নেই, নৈতিক মূল্যবোধ শব্দটি এসেছে মাত্র একবার।

উন্নয়ন কৌশল যত ভালই হোক তার যদি যথাযথ বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে সে কৌশলের কোন অর্থ হয় না। পিআরএসপিতে বর্ণিত কৌশলগুলি যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণের সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময় পর পর পরামর্শক পাঠিয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে থাকে। এটি আপাতঃ দৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে না হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার আগ্রহের বিষয় এক থাকে না। তাছাড়া কখনো কখনো যে ঋণদাতাদের স্বার্থ আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। পিআরএসপি হচ্ছে সরকারের নিজস্ব দারিদ্র বিমোচন কৌশল; ফলে তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে। সরকারের উচিৎ অন্ততঃ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পিআরএসপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।   সাধারন জনগন, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া যেন পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা ও তার ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।